পরমব্রহ্মরূপিণী মা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

একটি মাত্র শব্দাক্ষর ''মা''! আত্মতত্ত্ববিদ শাস্ত্রকারগণ এই শব্দাক্ষরকে অব্যয় বলেন অর্থাৎ যাঁহার ব্যয় বা লয় নাই। যিনি এক ও অদ্বিতীয় অথচ বহুধা অনন্তরূপ ধারণ করিবার মহাশক্তি যাঁহাতে চির সন্নিবেশিত, তিনিই পরমব্রহ্ম, পরাৎপর ব্রহ্ম চৈতন্য, তিনি অনন্ত ও ভূমা। একটি বীজের ভিতরে চণকাকারে দুইটি সমরূপ দানার মত ''বীজ'' শব্দের মধ্যে বী +জ = বীজ, এই দুইটি বর্ণ আছে। ''বী'' অর্থাৎ বিশিষ্ট বা বিরাট রূপে এবং ''জ'' অর্থে জন্ম। যে মহাশক্তি বিশিষ্টভাবে বিরাটরূপে বহুধা ধারায় সৃষ্টি মধ্যে আত্মবিস্তার করে, তাহার নাম ''বীজ''। শরীরের শক্তি যেমন শুক্র, আত্মা বা মায়ের শক্তি, সেইরূপ পরমব্রহ্মের পরমাত্ম-অমৃতময় সৃজন শক্তি হইল বাক্‌শক্তি। এই বাক্ ব্রহ্মশক্তিরূপা সনাতনী, স্বয়ং প্রকাশ শক্তি পরমব্রহ্মের স্বভাব। বীজের ভিতরে বৃক্ষ এবং বৃক্ষের ভিতরে বীজ যেমন নিত্য বর্তমান, তেমন ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপ দুইটি অবস্থাও ইহাতে অনন্তরূপে রহিয়াছে। ব্রহ্মের এই অখণ্ড বাক্ শক্তির নাম ''ওঙ্কার'', যাহা হইল ব্রহ্মবীজ। এই ওঙ্কাররূপ শব্দব্রহ্মের ইচ্ছারূপী শক্তিই হইলেন ''মা''। মায়ের সূক্ষ্ম অবস্থাই হইল মহামায়া, ইচ্ছারূপী হইয়া তিনি হন যোগমায়া আর মায়া। যোগমায়া শক্তিতে মা জগৎ সৃজন করেন, আর তাঁহার তেজঃ প্রভাবেই বিশ্ব সমুদ্ভূত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে মায়া-প্রপঞ্চময় জগৎ প্রকাশ পায়। যে শক্তি প্রভাবে মায়া ও যোগমায়াকে জ্ঞাত হওয়া যায়, যিনি যোগীগণের চিন্তনীয়া, সেই জগন্ময়ী দুর্গাই পরমতত্ত্ব — ''মা''। 'মা' ব্রহ্মময়ী, ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি; অরূপা আবার সর্ব্বরূপা, লীলামার্গে পুরুষ ও প্রকৃতি দুই-ই। ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তিই আদ্যাশক্তি মা, স্বরূপে দেবী ভগবতী স্বরূপিণী। যোগমায়া হইলেন পরমব্রহ্মের অন্তরঙ্গা শক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তি হইলেন মহামায়া। দুই-ই ব্রহ্মের প্রকৃতি একই আদ্যাশক্তি পঞ্চতন্মাত্রা ও পঞ্চভূতে বিরাজ করিতেছেন অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে আত্মগোপন করিয়া। পরাশক্তি নির্গুণা এবং অপরাশক্তি ভোগাত্মিকা। আত্মসত্তা মধ্যে কুলকুণ্ডলিনী চিৎশক্তি এবং কুণ্ডলিনী সত্তার জীবনী শক্তি বা প্রাণশক্তি বা প্রকৃতি। স্থূল ও সূক্ষ্ম শক্তির পঞ্চ প্রকারে বিকাশ হইতে দেখা যায় — পরা, অপরা, যোগমায়া, মহামায়া ও কুণ্ডলিনী। আধার, কাল ও পাত্র অনুযায়ী শক্তির ক্রিয়া বিভিন্ন গুণসম্পন্না হইয়া থাকে। যেমন ক্ষিতিতে উর্ব্বরতা, জলে আর্দ্রতা, অগ্নিতে দাহিকা, বাতাসে স্পর্শ এবং ব্যোমে শব্দশক্তি বিরাজিতা। বেদের প্রণব, বেদান্তের ব্রহ্ম, তন্ত্রের মহাশক্তি, যোগের আত্মা এবং পুরাণের ভগবান মূলতঃ একই ব্রহ্মকে বুঝায়। সগুণ ও নির্গুণের সম্মিলিত ভাবই ব্রহ্ম। সগুণে মহাশক্তি বা ''মা'' এবং নির্গুণে শিবব্রহ্মরূপ ''ম''কার বা ''বাবা''। শিবব্রহ্ম লীলাময়, দেবী শিবানী শক্তি লীলাময়ী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের অবস্থা; ইঁহারা প্রত্যেকেই খণ্ড মহাশক্তির আধার মাত্র। এই ত্রয়ী শক্তির একতাই মহাশক্তি, আদিশক্তি বা ব্রহ্মময়ী 'মা'। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণের সাম্য অবস্থাই প্রকৃতি। সেইজন্যে ''মা'' ত্রিগুণময়ী; তাই প্রকৃতিকে ত্রিগুণময়ী বলা হয়। কাল সংঘাতে ''হুং''কার শব্দ করিয়া প্রকৃতি দ্বিধা বিভক্ত হয়। এক হইতে দ্বি-অংশের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া পরস্পর মিলনেচ্ছা স্বভাবগত ধর্ম। পরস্পরে স্বাভাবিকভাবে দ্বি-অংশের মিলন যখন সম্ভব হইল না তখন প্রকৃতি পুরুষের বিপরীতভাবে মিলনে তৎপর হইলেন। প্রকৃতি-পুরুষের এই মিলন বা সংযোগ হইতেই আকাশের সৃষ্টি হয়। এই আকাশ বক্ষেই যোগমায়া অবলম্বনপূর্বক মহাইচ্ছাধীন হইয়া মা মহামায়া নিজ শক্তিতেজবলে মায়িক জগৎরূপ বিশ্বের সৃজন করেন।

''যাং প্রপশ্যন্তি দেবেশীং ভক্তানুগ্রাহিণো জনাঃ।
তামাহু পরমং ব্রহ্ম দুর্গাং ভগবতীং মুনে ।।''

—অথর্ব্ব বেদ

যাঁহার কৃপায় ভক্তজনেরা তীব্র ভক্তির দ্বারা যাঁহাকে বিশ্বজননী রূপে দর্শনলাভ করেন, যাঁহাকে ভগবতী দুর্গা বলা

হয়, তিনিই ব্রহ্মময়ী, ব্রহ্মতত্ত্ব। বহুরূপে বহুভাবে শিব-দুর্গা, কৃষ্ণ-কালী বা হরি-হর, যে বিগ্রহই হোক না কেন, যখন কোনও সাধকের ''মা''কে পূজা করিবার তীব্র বাসনা মনে জাগ্রত হইয়া ওঠে, তখন শুদ্ধাভক্তি প্রভাবে সাধকের অন্তঃসত্তায় মায়ের ভাবময় মূর্তি অন্তরাকাশে প্রকটিত হইয়া ওঠে। আপন জ্ঞানচক্ষু দ্বারা বিশ্বমায়ের বিশ্ববরেণ্য চিন্ময়ীরূপ তখন সাধক ভক্তিমুগ্ধ নয়নে আপন ভাবে বিগলিত হইয়া দর্শন করিতে সক্ষম হয়। যেখানে ভক্তি নাই, সেখানে ভগবানও নাই, 'মা'ও নাই। শুদ্ধাভক্তি ভাবে পরিস্ফুট হইলে পরে তখন ভাবমূর্তির স্পন্দন হৃদয়ে উপলব্ধ হয়। অন্তঃস্থিত এই সকল ভাবমূর্তি প্রাণবন্ত হইয়া সাধককে অখণ্ড জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকে। ইহাকেই দৈবীকৃপা বা মায়ের কৃপা বলা হয়। যে সাধক অন্তরে মায়ের চিন্ময়ীরূপ প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেন তিনিই শুদ্ধাভক্ত। সেই শুদ্ধাভক্তে ভক্তির ভাবময় শক্তিতেই বাহ্যিকভাবে প্রাণ-প্রতিষ্ঠিত করিয়া মৃন্ময়ীর মাঝে চিন্ময়ীকে পূজা করা হয়। ভক্তির তীব্র সংবেগ, ভাব না থাকিলে বাহ্যিক সব মূর্তি বা বিগ্রহাদি নিষ্প্রাণ রহিয়া যায়। অতএব সাধকের তীব্র ভক্তিতে, শুদ্ধাভক্তির শক্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় বাহ্যিক বিগ্রহে। ভক্তি = প্রাণ ও মহাপ্রাণ; দর্শন = জ্ঞান ও মহাজ্ঞান, স্পর্শন = শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা, আস্বাদন = আনন্দ ও লীলা মাধুর্য্য।

শুদ্ধাভক্তিই ভগবান বা ভগবতী, পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরী। যেখানে ভক্তি, সেইখানেই বিরাজিত ভগবান বা ভগবতীর মহাভাবময় চিন্ময় মূর্তি। পঞ্চভূতে আমাদের সত্তার দেহ যেমন নির্মাণ হয়, তেমনি শুদ্ধা ভক্তিতে ভগবান বা ভগবতীর সগুণ আকৃতি মূর্ত হয়। আকাশরূপী দিঙ্‌মণ্ডল যাঁহার আচ্ছাদনরূপী বস্ত্রাঞ্চল, আকাশবক্ষে নক্ষত্রপুঞ্জ যাঁহার পুষ্প, স্নিগ্ধ সুগন্ধ বায়ু যাঁহার ধূপ, আদিত্যরূপী পবিত্র অগ্নি যাঁহার মঙ্গল দীপ, নৈবেদ্য যাঁহার অমৃতময় স্বর্গীয় সুধা, কি দিয়ে তাঁহার পূজা হইবে? কে তাঁহাকে সাজাইবে? তিনি যে অপরূপ বিশ্বপ্রকৃতির সাজে সাজিয়াই প্রকটিত হইয়াছেন বিশ্বমাঝে! তাই ভক্তের নিজের কিছু দিয়া পূজা করিবার বা সাজাইবার তো কিছু বাকি রাখেন নাই ''মা''। তবে আমাদের দেবার আর কি আছে তাঁকে? ''মা'' বলিয়া বাৎসল্য ভরে তাঁহাকে ডাকা ছাড়া আর কি দিবার আছে? তাই তো সৃষ্টিতে আদি হইতে অন্ত, জন্ম হইতে মৃত্যু অবধি সকল জীব জন্তু প্রাণী মাত্রেই ''মা'' শব্দ উচ্চারণ করে। তাই ''মা'' শব্দাক্ষরই সর্ব্বজীবের মহামন্ত্র স্বরূপ একমাত্র বীজমন্ত্র।

কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা মায়ের পূজা হয়। (১) কর্ম, আধার বা পৃথিবী। মায়ের পূজার কর্মে বিশ্বাসই ভক্তের আধারের সাত্ত্বিক গুণ যাহার দ্বারা সাধক মাতৃপূজায় ব্রতী হয়। অন্যদিকে জীবের কর্মক্ষেত্র বা আধার হইল এই পৃথিবী। (২) জ্ঞান, পিতৃরূপা। যিনি শিবস্বরূপ নির্গুণ আবার সগুণ হইয়া ধরণীকে ভরণ-পোষণ করেন, তিনি মঙ্গলময় ও মঙ্গলকর। অন্যদিকে জ্ঞান সাধক-আধারকে শুদ্ধ বিবেক, বিচার প্রদান করিয়া সাধকের সংকল্পকে সিদ্ধ করায়। (৩) ভক্তি হইলেন 'মা' স্বয়ং। ভক্তির শক্তিতেই সাধক পূর্ণসিদ্ধ ও আপ্তকাম হইতে সক্ষম হন। কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনকে লইয়াই মায়ের পূজা করিতে হয়। 'পূজা' অর্থাৎ শ্রদ্ধা নিবেদন। পূজাঙ্গে রহিয়াছে 'আরাধনা' বা আহ্বান 'প্রার্থনা' অর্থাৎ কৃপাভিক্ষা। তৎপরে 'ভজনা' বা মহিমা কীর্তন; ইহার মধ্যে ভাবাপ্লুত হইয়া স্তবস্তুতি বা ভগবৎ মহিমা গুণগান করা অর্থাৎ বন্দনা। এইগুলি বহিরঙ্গের পূজা। তারপর, আসন অর্থাৎ কূটস্থে মনের স্থিতি। ইহা অন্তরঙ্গাভাবে অবস্থান করাকে বুঝানো হইতেছে। তৎপরে ন্যাস, অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরস্থ নাড়ীশোধনকরণ এবং মনে পবিত্রতাভাব ধারণ। অন্তর সাধনায় মন্ত্রন্যাস, বীজন্যাসাদিও রহিয়াছে। তারপর ধ্যান অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা আরাধ্যকে আনয়ন; ধারণা অর্থাৎ বুদ্ধি কূটস্থ মধ্যে গগনগুহায় স্থাপন; জপ অর্থাৎ ভক্তিসূত্রে আরাধ্যের সহিত বন্ধন; তৎপরে যজ্ঞ অর্থাৎ আত্মসমর্পণ অথবা হোম অর্থাৎ বিষয়ীভূত মানস দ্রব্য দাহন। আচমন অর্থাৎ প্রাণের মন্থন করিয়া সৃষ্টিতত্ত্বের সুধাকে আহরণ করা; তৎপরে প্রাণায়াম দ্বারা দেহাভ্যন্তরস্থ বিচ্ছিন্ন প্রাণশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া হৃদয়ে মহাপ্রাণে প্রতিষ্ঠিত করা। পূজা সমাপনান্তে প্রণাম অর্থাৎ আপন অহমিকাকে আরাধ্যের পদতলে অর্ঘ্যদান করা। দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ, নারায়ণ ইত্যাদি যে মূর্তি সাধক সাধনা করুক না কেন, যদি সে মূর্তি প্রাণবন্ত হইয়া আনন্দ প্রদান না করিতে পারে তবে সাধকের সাধনা বা ভজনা বৃথায় পর্য্যবসিত হয়। তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধানের মাধ্যমে আর্য্যঋষিগণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে ত্যাগ এবং স্বপ্রবৃত্তিকে নিবৃত্তির মাধ্যমেই ভগবান বা সচ্চিদানন্দকে লাভ করা সম্ভব। এই সচ্চিদানন্দরূপ আনন্দকে নির্গুণ-সগুণে লাভ করাই পরব্রহ্মস্বরূপা আনন্দময়ী ''মা'' কে জ্ঞাত হওয়া ও পাওয়া।